কিংবদন্তি পন্ডিত বারীণ মজুমদার

সংশপ্তক হাসান

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২১-৩ অক্টোবর ২০০১

পণ্ডিত বারীণ মজুমদার উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন সংগীতজ্ঞ। একাধারে সংগীত শিক্ষক, রাগসংগীত বিশারদ ও উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী। বারীণ মজুমদার ১৯২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) পাবনা জেলার রাধানগরে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাবনায় মজুমদারদের জমিদারি ছিল। তবে প্রজাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও কাটখোট্টা স্বভাবের ছিলেন না তারা। শিল্প সংস্কৃতির সমঝদার হওয়ার পাশাপাশি নিজেরাই সক্রিয় ছিলেন এর বিভিন্ন শাখায়। তার বাবা নিশেন্দ্রনাথ মজুমদার একাধারে একজন সংগীতশিল্পী ও নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন। অন্যদিকে মা মণিমালা মজুমদার ছিলেন সেতার বাদক। শিল্পের সাধক এমন পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নেওয়া বারীণ মজুমদারও শৈশব থেকে সংস্কৃতিপ্রেমী হয়ে ওঠেন। তবে তার আগ্রহের বিষয় ছিল গান।

ছোট বয়সেই সংগীতের প্রতি ভাব ভালোবাসা দেখে বাবা নিশেন্দ্র মজুমদারও মনস্থির করেন, ছেলেকে গানই শেখাবেন। তাকে পাঠিয়ে দেন ভারতে। সেখানে গিয়ে বারীণ মজুমদার সংগীতে তালিম নেন ভীষ্মদেবের কাছে। গুরুর কাছে নিষ্ঠার সাথে তালিম নিচ্ছিলেন বারীণ। তার এই আগ্রহ দেখে পিতা নিশেন্দ্র মজুমদার লক্ষণৌর পন্ডিত রঘুনন্দনকে নিয়োগ দেন তার সংগীত শিক্ষক হিসেবে। পরে ছেলেকে সংগীত বিষয়ে পড়াশোনার জন্য লক্ষণৌর মরিস কলেজ অব মিউজিকে তৃতীয় বর্ষে ভর্তি করিয়ে দেন। এই কলেজ থেকে বি. মিউজিক ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। এরপর ১৯৪৩ সালে ওই কলেজ থেকেই বারীণ মজুমদার সংগীত বিশারদ ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সময়টাতে তিনি তালিম নেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ পন্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, অধ্যাপক জে.এন. নাটু, ওস্তাদ হামিদ হোসেন খাঁ প্রমুখ সংগীতজ্ঞের কাছে। এর পরে আলাদাভাবে সংগীতের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান আহরণ করেন ওস্তাদ খুরশীদ আলী খাঁ, চিন্ময় লাহিড়ী, আফতাব-এ-ম্যুসিকী, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে। এদিকে ভারতে বারীণের এই সংগীত সাধনা যখন চলছিল ঠিক তখন শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিমের সেই ভয়ানক দাঙ্গার সময় বারীণের কাছে পিতৃভিটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়। আর দেরি না করে ফিরে আসেন পাবনা। স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বেশিদিন সেখানে থাকা হয়নি বারীণ মজুমদারের।

এর বছর পাঁচেক পর ১৯৫২ সালে এক কঠিন সময় এসে উপস্থিত হয় বারীণ মজুমদারের জীবনে। জমিদারি হুকুম দখল আইনের বলে ১৮ বিঘা জমির ওপর নির্মিত তাদের বসতভিটাসহ সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি সরকারি দখলে চলে যায়। সহায় সম্পত্তি এভাবে বেদখল হয়ে যাওয়ায় বেশ দুরাবস্থায় পড়তে হয় বারীণ মজুমদারকে। এ অবস্থায় পাবনা ত্যাগ করেন তিনি। চলে আসেন ঢাকায়। সংগীতে সুশিক্ষিত ছিলেন বারীণ। তাই ঢাকায় এসে সংগীতকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। ওই বছর বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন তিনি। পাশাপাশি ঢাকা বেতারে নিয়মিত রাগসংগীত পরিবেশন শুরু করেন। এ সময় তিনি দেশে সংগীতের কাঠামোগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সিদ্ধান্ত নেন একটি সংগীত কলেজ প্রতিষ্ঠার। ১৯৬৩ সালের ১০ নভেম্বর কাকরাইলের একটি বাসায় স্বপ্নের বীজ বপন করেন তিনি। মাত্র ৮৭ টাকা, ১৬ জন শিক্ষক ও ১১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দেশের প্রথম কলেজ অব মিউজিকের কার্যক্রম শুরু করেন। সংগীত কলেজ খুলতে গিয়ে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি তাকে। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশূল হতে হয়েছে। এমনকি হাজতবাসও করতে হয়েছে। সময় পক্ষে ছিল না তার। খোদ পাকিস্তান সরকারেরও সায় ছিল না এতে। কলেজ অব মিউজিক নিয়ে তৎকালীন শাসক মোনেম খাঁয়ের মন্তব্য ছিল নেতিবাচক। কিন্তু এসব উপেক্ষা করেই এগিয়ে

যাচ্ছিলেন সংগীত মহাবিদ্যালয়ের এই স্বপ্নদ্রষ্টা।

তাকে থামিয়ে দেওয়ার কম চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু থেমে যাননি তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮ সালে তার এই কর্মযজ্ঞ আরও একধাপ এগিয়ে যায়। সে বছর তিনি ডিগ্রি ক্লাসের সিলেবাস তৈরি করে সংগীত মহাবিদ্যালয়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজে পরিণত করেন। অধিভুক্তির পর সংগীত কলেজকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করায় মন দেন তিনি। তহবিল সংগ্রহ শুরু করেন একাধিক সংগীত সম্মেলন আয়োজন করে। সে সম্মেলনে নাজকোত-সালামত, আমানত-ফতেহ, মেহেদী হাসান, আসাদ আলী খাঁসহ বহু গুণী শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদিকে শাসকের রক্তচক্ষু তখনও তাড়া করে ফিরছিল বারীণ ও তার সংগীত কলেজকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে তারই প্রতিষ্ঠিত সংগীত মহাবিদ্যালয়ের গ্রান্ট তসরুপ করার দায়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় তার বিরুদ্ধে। এই মামলায় ১৮ দিন হাজত বাস করতে হয় তাকে। তবে এতসব প্রতিকূলতা পেরিয়ে দিনশেষে বারীণ মজুমদারেরই জয় হয়। আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিজস্ব জায়গায় মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে ওই সংগীত কলেজটি যেন তারই প্রমাণ দিচ্ছে। পাশাপাশি আরও একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান করেছিলেন তিনি। রাগসংগীতের উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মনিহার সংগীত একাডেমি।

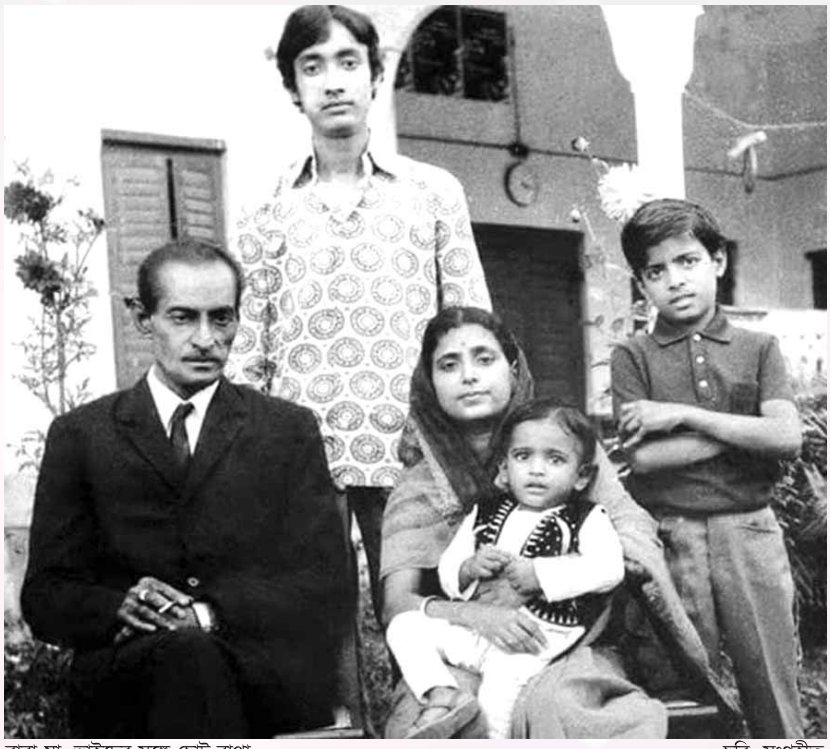

বাবা-মা, ভাইদের সঙ্গে ছোট বাপ্পা ছবি: সংগৃহীত

বারীণ মজুমদারের কর্মজীবন ছিল সংগীতময়। আজীবন সংগীত বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে নিজের সেরাটা দিয়ে গেছেন। ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত অডিশন ও সেডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিষয়ক পরীক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি সংগীত পরিবেশনেও নিয়মিত ছিলেন। বিভিন্ন একক সংগীতানুষ্ঠানে গান পরিবেশন করতেন। এছাড়া সংগীত বিষয়ক 'সুর সপ্তক' নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৮২ সাল থেকে দীর্ঘ সময় তিনি এই মাসিক পত্রিকায় সম্পাদনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা সংগীতের এই অভিভাবক এদেশের সংগীতকে যা দিয়েছেন তা পর্বতসম। তার এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একাধিক পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে তাকে। পাকিস্তান সরকারও তাকে পুরস্কৃত করেছে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে বেসামরিক খেতাব 'তমঘা-ই-ইমতিয়ায' দেওয়া হয় তাকে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয় ২১শে পদক। সেইসঙ্গে বরেন্দ্র একাডেমী কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়া কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট পুরস্কার, সিধু ভাই স্মৃতি পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত করা হয় তাকে। বারীণ মজুমদার ২০০১ সালে পান সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পদক (মরণোত্তর)। এই সংগীতজ্ঞের অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন দেশের ধ্রুপদী সংগীতের আরেক বরেণ্য শিল্পী ইলা মজুমদার। তার কণ্ঠ যেমন দেশের সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনই তিনি সকল কাজে বারীণ মজুমদারকে যুগিয়েছেন প্রেরণা।

ইলা মজুমদার না থাকলে বারীণ মজুমদার হতে পারতেন না বলে মনে করেন তাদের সন্তান জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক বাপ্পা মজুমদার। তিনি বলেন, বাবা যা করেছেন তা মা না থাকলে হয়তো করতেই পারতেন না। তার প্রত্যেক কাজেই মায়ের প্রেরণা ও সমর্থন ছিল। পিতা বারীণ মজুমদারকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বাপ্পা আরও বলেন, বারীণ মজুমদার একজন ভালো স্বামী ও পিতা ছিলেন। অনেকের মধ্যেই এই গুণটি বিরল। সংসারে কার কোন চাহিদা মিটল না, সেসব বিষয়ে তিনি সবসময় খেয়াল রাখতেন। বিশেষ করে আমাদের পড়ালেখার ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজ রাখতেন তিনি। রান্না করতে পছন্দ করতেন। বাজার করতেও ভালোবাসতেন। তার আরেকটি পছন্দের বিষয় ছিল শিকার। শিকার করতে ভালোবাসতেন। তবে এটা কন্টিনিউ করেননি। একসময় ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা বৃক্ষপ্রেমী ছিলেন। বাগান করতে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, গাছেরা তাকে বোঝে। একজন শৌখিন মানুষের যতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে তার সবই বাবার মধ্যে ছিল। বারীণ মজুমদারের বড় সন্তান মূক অভিনয় শিল্পী পার্থ প্রতীম মজুমদার। বাবাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন, সুরের প্রকারভেদ আমরা বাবার কাছে শিখেছি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সুর দুই রকমের হয়। একটি অসুরের সুর, অন্যটি সুরের সংগীত। তিনি আমাদের সুরের সংগীতটাই করতে বলেছেন।

সংগীত নিয়ে বইও লিখেছেন বারীণ মজুমদার। 'সংগীত কলি' ও 'সুর লহরী' নামক সংগীতবিষয়ক দুটি বই আছে তার। বরেণ্য এই সংগীতজ্ঞের জীবন অবসান ঘটে ২০০১ সালে। সে বছরের ৩ অক্টোবর ঢাকার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বারীণ মজুমদার চলে গেলেও রেখে গেছেন তার সংগীত মহাবিদ্যালয়টি। প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রতি বছর সংগীতের আলোয় আলোকিত হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী যা দেশের সংগীতাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ মাসের ১৫ তারিখে জন্মেছিলেন সংগীতে নিবেদিত প্রাণ এই কর্মবীর। তার প্রতি রইল অনন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।